# কৃষ্ণচন্দ্র মহা-বিদ্যায়তনের

## হীরক জয়ন্তী

১৯৫৮

**মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবী**

"প্রতিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণচন্দ্র মহা বিদ্যায়তন" (স্থাপিত সন ১৩০৩)

জন্ম ১২৬০।২৫শে জ্যৈষ্ঠ মৃত্যু ১৩১৩।৫ই অগ্রহায়ণ।

# কৃষ্ণচন্দ্র মহা-বিদ্যায়তনের ইতিকথা

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী

"রঞ্জনী"
হেতমপুর রাজবাটী (বীরভূম)
১৩৬৪।৭ঠা ফাল্গুন।

বীরভূম জেলায় দাঁড়কা গ্রামে কালাচাঁদ রায়ের গৃহে ১২৬০ সাল ২৫শে জৈষ্ঠ্য আবির্ভূতা হলেন, মা আমার পদ্মসুন্দরী। মাতৃদেবী পিতাম্বরী দেবী বুকে তুলে নিলেন কন্যাকে। যদিও কন্যা ও পুত্র পিতাম্বরী দেবীর আরও কয়েকটি ছিল, কিন্তু কেন জানিনা এই কন্যাই তাঁর যেন আরতির প্রদীপ, তাই সেই প্রদীপে ঢালতে লাগলেন ঘি, আর উস্‌কাতে লাগলেন সলতে। এই করেই তিনি কন্যাকে করলেন ১১ বৎসরের। পদ্মের প্রত্যেক পাঁপড়িগুলি সেই আলোতেই খুলে গিয়ে নিজেদের করলো বিকাশ—তখনই পদ্মসুন্দরী মায়ের আমার লাবণ্য পড়লো উপচে।

কাটোয়ায় গেলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পুণ্যার্জনের জন্য গঙ্গাস্নানে—এদিকে দাঁড়কার কালাচাঁদ রায়ও গিয়েছিলেন। ~~তাঁদের সাথে~~।

ভবিতব্যের অদৃশ্য হাতের হাতছানিতে কাটোয়ায় এগিয়ে এসেছিলো যেন দুটি পরিবার পরস্পরের সাথে পরস্পরের কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ হবার জন্যই।

যেখানে দেবতার নির্দেশ সেখানে মানুষের কি ক্ষমতা তাকে প্রতিরোধ করতে পারে, তাই বীরভূম জেলার হেতমপুরের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর, গঙ্গার ঘাটে একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়েকে দেখে, মনের লুকান বাসনা জেগে উঠে কড়া শাসনে এগিয়ে নিয়ে গেল, গঙ্গার ঘাটে দাঁড়কার কালাচাঁদ বাবুর কাছে। "এই জীবন্ত প্রতিমা কি আপনার মশাই?" কালাচাঁদ বাবু বিনয় জড়িত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার"। "মেয়েটি বড় চমৎকার, জানতে পারি মশায়ের নাম, গোত্র?" "কাকে,—আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমার নাম শ্রীকালাচাঁদ রায়, "শাণ্ডিল্য গোত্র।"

"মহাশয়ের নিবাস?" "বীরভূম জেলা দাঁড়কা গ্রামে।"

"কিছু মনে করবেন না মশাই আমার একটি পুত্র আছে, জানেন তো ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ, তাই ইচ্ছাকে দমন করতে পারলাম না" বল্লেন কৃষ্ণচন্দ্র বাবু। তারপর—তারপর যে যাঁর বাসস্থানে ফিরে

এলেন। পিছনে ফেলে রেখে এলেন ভাগীরথীর কলকল নিনাদ।

কন্যাকে গোত্রান্তর করবার বাসনা চঞ্চল করে তুললো কালাচাঁদ বাবুকে। তাঁর আদরের পদ্মকে তো আর অপাত্রে দিতে পারেন না।

নাটকীয় ঘটনার মধ্যে যখন তিনি উপযুক্ত পাত্র পেলেন তখন ইচ্ছাটাও প্রবলতর হয়ে উঠলো। মানুষের মনের বাসনাই এনে দেয় উদ্যম, উৎসাহ, তাই কালাচাঁদ বাবুও এগিয়ে চল্লেন তার মনের বাসনা পূরণের অভিলাষে।

মানুষের মন নিস্তরঙ্গ দিঘির মত কেটে যায় না। তাই কিছু আশা, কিছু আনন্দ, কিছু দুঃখ, কিছু শোক—চাওয়া ও পাওয়ার অমিল নিয়েই চলেছে কালের স্রোত—সেই টানে নিজেদের ছেড়ে না দিয়ে কি কেউ চলতে পেরেছে? তাই এদুটি পরিবারও দিলেন ছেড়ে। আকস্মিক বজ্রাঘাতের ন্যায় যখন হঠাৎ হেতমপুরের কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর মৃত্যুর খবর পেলেন কালাচাঁদ বাবু তখন সত্যই শোকে মুহ্যমান হলেন।

দুটি সংসারে শোকের করুণ সুর বেজে উঠলো। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাবুর জননী মন্দাকিনী দেবী পুত্রশোকে হাহাকার করে উঠলেন। মাতৃ পিতৃ হারা নাবালক পৌত্রকে অবলম্বন করে শোকের প্রথম রেশটা কাটিয়ে উঠলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে নাবালক হিসাবে শ্রীরামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তি গেল কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে; সরকারের আদেশে শ্রীরামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী গেলেন কাশীতে। শ্রীরামের মতই বনবাস হোল তাঁর। শূন্য ভিটায় হেতমপুরে পড়ে থাকলেন জমিদার গৃহিনী মন্দাকিনী দেবী, আর মুখে বলতে লাগলেন আমি রাম বিহীন অযোধ্যায় পড়ে আছি, আমি শবরীর মত রামের অপেক্ষায় বসে আছি।

কিছু দিন কেটে যাবার পর আবার কালাচাঁদ বাবুর বাসনা তরু সঞ্জীবিত হয়ে ডালপালা করলো বিস্তার তাই নবীন উৎসাহে আবার বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠালেন মন্দাকিনী দেবীর কাছে।

এদিকে মন্দাকিনী দেবীও তাঁর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা দাঁড়-কায় কালাচাঁদ রায়ের নিকট তাঁর পৌত্রের সহিত পদ্মসুন্দরী দেবীর শুভপরিণয় সম্পন্ন হয় ইহাই তাঁহার বাসনা প্রকাশ করে পাঠালেন,— তাঁর মৃত পুত্রের ইচ্ছানুযায়ী।

হোলও তাই। পতি পত্নীর নিবন্ধন কেউ রদ করতে পারে না। শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীরামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও পদ্মসুন্দরী দেবীর হোল শুভ পরিণয়। দাঁড়কায় দণ্ডকেশ্বর শিবের আরাধনা সার্থক হোলো মায়ের আমার—পেলেন শিবতুল্য স্বামী শ্রীরামরঞ্জন কে। কিন্তু যিনি তাঁকে আনতে চেয়েছিলেন সেই দেবতুল্য শ্বশুরকে এসে পেলেন না। সেই কাটোয়ায় জাহ্নবীরতীরে কিছু ক্ষণের স্নেহের উৎস, তাঁকে যে উৎসাহিত করেছিল, সেই উৎসের জের টেনে তিনি নিজেকে ক্ষান্ত করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যায়তন তাঁর নামে প্রতিষ্ঠা করে।

ইহার কিছু পূর্ব্বে শ্রীরামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহারাজা উপাধি পেয়েছিলেন। বালিকা অবস্থায় দাঁড়কা থেকে এসেছিলেন মহারাণী পদ্ম সুন্দরী তাই তিনি কতটুকুই বা বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন। রাজ-বংশের সাথে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিলো রাজবিদ্যালয়ের শিক্ষক রমানাথ মুখোপাধ্যায়ের তিনিই আমার পদ্মসুন্দরী মায়ের গৃহ-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হলেন। উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট জ্ঞানের আলোক প্রাপ্তা হলেন মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবী—তাই বীরভূমের মধ্যে স্থাপন করলেন জ্ঞানের মন্দির - বাংলার প্রথম গ্রামীন বিদ্যায়তন। তাঁর জোতির্ম্ময়ী রূপ, তেজদীপ্তি ও অদ্ভুত স্নেহ সকলকে মুগ্ধ করে দিত। তিনি শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল সমানভাবে পালন করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন পল্লীদুহিতা ও পল্লীবধু, কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিলো সেকাল ও একালের সমন্বয়।

তাঁর পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা হয়েছিল। প্রথম পুত্র শ্রীনিত্য নিরঞ্জনকে কালের করাল গ্রাসে আহুতি দিয়ে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর জীবকৃষ্ণের সেবার আদর্শ বুকে করে নানাভাবে কর্ম্মপ্রচেষ্টায় নিরতা ছিলেন। তিনি ছিলেন তপস্বী স্বামীর যোগ্যাসহধর্ম্মিনী, তাঁর মধ্যে ত্যাগ, তপস্যা ও জ্ঞানের একাধারে সমন্বয় ছিল।

পুণ্যশ্লোক মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী যোগ্যাসহধর্ম্মিনী পেয়ে নিজেকে প্রকাশ করবার আরও সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি রাজ বিদ্যালয়, টোল, দাতব্য চিকিৎসালয়, বৃন্দাবনে দেবালয় আরও বহু সৎপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—যার জন্য অদ্যাবধি তাঁর বংশ-

ধরেরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেন।

সন ১৩১৩।৫ই অগ্রহায়ন মহারাজা শ্রীরামরঞ্জন চক্রবর্ত্তীকে রেখে ও চার পুত্র শ্রীসত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শ্রীমহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শ্রীসদা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীকমলা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীকে রেখে অমর ধামে চলে গেলেন মহারাণী। আর রেখে গেলেন অমর কীর্ত্তি—কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যায়তন। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।